কৃষি ও কৃষকের কল্যাণ : বর্তমান হালহকিকৎ

বিশ্ব অর্থনীতি মন্দার কবলে। নৈরাজ্যের এই গাঢ় আঁধারে ভারত যেন এক বাতিঘর—লাইটহাউস। বিকাশ হার বৃদ্ধিতে ভারত ইদানীং চিনকেও টপকে গিয়েছে। বিকাশ হার বৃদ্ধিই অবশ্য যথেষ্ট নয়; এই বৃদ্ধির সুফল দেশের প্রতিটি মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া চাই। বর্তমান সরকারের লক্ষ্য তাই সর্বজনীন উন্নয়ন (ইনক্লুসিভ ডেভলপমেন্ট)। এই উদ্দেশ্য হাসিল করতে হলে কৃষি ও কৃষক-এর কল্যাণসাধন জরুরি। কৃষি ও কৃষকের মঙ্গলে সরকারের বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়ে এই নিবন্ধে আলোচনা করেছেন— **জে. পি. মিশ্র**

কৃষি আজও ভারতের অর্থনীতির বৃহত্তম ক্ষেত্র। ২০১৪-১৫তে সার্বিক মোট মূল্য সংযোজনে (ওভারঅল গ্রস ভ্যালু অ্যাডেড) কৃষির অংশভাগ ছিল ১৬.১ শতাংশ। অর্থনীতির ইঙ্গিত বা সংকেতবাহী হওয়া ছাড়াও, খাদ্য ও পুষ্টি এবং কর্মসংস্থানের প্রেক্ষিতে সামাজিক নিরাপত্তার জন্য এই ক্ষেত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কৃষিক্ষেত্র থেকে রুজিরোজগার জোটে দেশের বহু মানুষের। গ্রামাঞ্চলের বেলায় এ কথা আরও বেশি সত্যি। তবে কিনা, কর্মসংস্থানে এই ক্ষেত্রের অংশভাগ কমে যাচ্ছে। ১৯৯৩-৯৪-এ কৃষিতে নিযুক্ত ছিল কর্মীবাহিনীর ৬৪.৮ শতাংশ। আর ২০১১-১২-তে তা দাঁড়ায় ৪৮.৯ শতাংশ। তথাপি, সবচেয়ে বেশি মানুষকে এখনও কাজ যোগায় কৃষি ক্ষেত্রই। শিল্প ও পরিষেবার মতো অর্থনীতির অন্যান্য ক্ষেত্রের তুলনায় কৃষিতে নিযুক্ত কর্মীদের রোজগারপাতি অবশ্য ঢের কম। কৃষক ও কৃষি ক্ষেত্রকে প্রায়শই কম বা বেশি ফলন এবং ফলস্বরূপ ফসলের দামের অনিশ্চয়তার সমস্যার মুখে পড়তে হয়। আবহাওয়ায় রদবদল বাড়ছে। সৌজন্যে জলবায়ু পরিবর্তন। খরা ও বন্যার বাড়বাড়ন্ত এসব সমস্যা মোকাবিলায় সাহায্যের প্রচলিত ব্যবস্থাদিকে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর বা মামুলি পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে। চাষবাসের উপর নির্ভরশীল লক্ষ লক্ষ পরিবারের মঙ্গলের জন্য জোরাল প্রচেষ্টা শুরু করা জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে। কৃষক কল্যাণের ক্ষেত্রে বেশ কিছু দিকে নজর দেওয়া দরকার। কৃষকদের মঙ্গলের জন্য ব্যবস্থা নেবার পাশাপাশি প্রাতিষ্ঠানিক-প্রচলিত ব্যবস্থাদির ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার উদ্যোগ নেওয়া উচিত। চাই উপযুক্ত প্রযুক্তি উদ্ভাবন ও আয় বাড়ানোর জন্য চাষির কাছে তা পৌঁছে দেওয়া। খাদ্যশস্য ও অন্যান্য কৃষিপণ্যের জন্য বেড়ে চলা চাহিদা মেটানোও হবে এর লক্ষ্য। উল্লেখ্য, আগামী ২০২০-২১ সালে ২৭ কোটি ৭০ লক্ষ টন খাদ্যশস্য দরকার। আর তৈলবীজের চাহিদা দাঁড়াবে ৭ কোটি ১০ লক্ষ টন। উৎপাদন বৃদ্ধির বর্তমান ভাবগতিক থেকে আঁচ করা চলে যে খাদ্যশস্যের চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে। কিছুটা ঘাটতি হবে ডালে। বনস্পতি/রান্নার তেলে অবশ্য টান পড়বে বেজায়। এখন এই তেলের চাহিদার ৬০ শতাংশ মোট আমদানির সুবাদে।

কৃষিতে দক্ষতা বিকাশ এবং আরও বিবিধ ধরনের পেশা বা জীবিকা অর্জনের পথ খুলতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি, চাষিদের ফসলের ন্যায্য দাম, কৃষির সমস্যাদি ঘোচানোর ব্যবস্থার জন্য এক সার্বিক উন্নয়ন প্রচেষ্টা আবশ্যক। এক্ষেত্রে বাজার এবং জমি সংক্রান্ত সংস্কারও অনেকখানি সাহায্য করবে। দেশের পূর্বাঞ্চলে খাদ্যশস্য উৎপাদন বাড়ানোর দিকে বিশেষ নজর দেওয়া চাই। ঝুঁকি কমাতে চাষিদের সাহায্য করতে হবে। আরও বেশি ধরনের কাজকর্মের মাধ্যমে পুবের রাজ্যগুলিতে চাষিদের আয় বাড়ানো দরকার। এজন্য ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে। দেখতে হবে এসব ব্যবস্থার সুযোগ যেন চাষির নাগালে আসে। সরকারের নীতি ও কর্মসূচির মূলকথা—কৃষক কল্যাণ। তাদের সমস্যার সুসার ও মঙ্গলের জন্য সরকার বেশি কিছু নতুন ধরনের ও গৎছাড়া উপায় হাতে নিয়েছে। আরও বেশি জমিতে সেচ এবং উন্নত কৃষি উপকরণ যোগানো ছাড়াও, যারপরনাই নজর দেওয়া হচ্ছে শস্যহানি ও পড়তি দামের ঝুঁকি থেকে চাষিকে রেহাই দেবার প্রতি। শস্য বিমা এবং জাতীয় কৃষি বাজার ও ফসলের ন্যায্য দাম মেলার দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। জৈব চাষ, সনাতন বা পরম্পরাগত কৃষি, পশুপালন ও মাছ চাষে লাভের অঙ্ক বেশি। কৃষির বৈচিত্রকরণে এসব দিকেও সরকারি কর্মসূচি গুরুত্ব দিয়েছে। অত্যাধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ও ফসল বিক্রিবাটার পন্থাপদ্ধতি চাষির কাছে তুলে ধরার জন্য চালু হয়েছে কিসান টিভি চ্যানেল। দেশের অজস্র চাষির কল্যাণ ও তাদের সমস্যা দূর করার জন্য সরকার গত দু' বছরে একগুচ্ছ কর্মসূচি ও প্রকল্প চালু করেছে। এর মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে :

(১) **প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা :** ভারতে ৫৫ শতাংশ চাষের জমি জলাভাবগ্রস্ত। এহেন দেশে চাষিদের কল্যাণ হাসিল করতে 'হর খেত কো পানি' এবং 'মোর ক্রপ পার ড্রপ' (প্রতি জলের ফোঁটায় আরও বেশি ফসল) এর জুড়ি নেই। সম্প্রতি চালু হওয়া প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা হর খেত কো পানি এবং মোর ক্রপ পার ড্রপ-এর প্রত্যাশা পূরণে সঠিকভাবেই এই প্রকল্প দ্রুত রূপায়ণে জোর দিয়েছে। সেইসঙ্গে, জল সঞ্চয় এবং তার সুষ্ঠু ব্যবহার

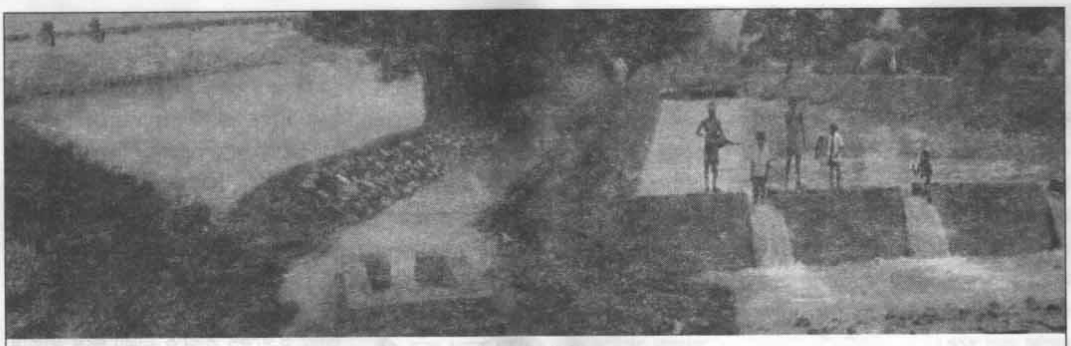

প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা

সূত্র : pmksy.gov.in

বাড়ানোও এর লক্ষ্য। ব্রত পালনের পদ্ধতিতে (মিশন মোড)-এ যোজনা রূপায়িত হবে। সেচের ব্যবস্থা করা হবে ২৮.৫ লক্ষ হেক্টরে। এ বাবদ বরাদ্দ হয়েছে ৪৫১০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ত্বরান্বিত সেচ সুবিধা কর্মসূচি (অ্যাকসিলারেটেড ইরিগেশন বেনিফিটস প্রোগ্রাম) এবং প্রধানমন্ত্রী কৃষি সিঁচাই যোজনা—হর ক্ষেত কো পানি খাতে ২০১৫-১৬-র সংশোধিত হিসেবে জলসম্পদ, নদী উন্নয়ন ও গঙ্গাকে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার মন্ত্রকের (MoWR, RD & GR) ২৫১০ কোটি টাকার অতিরিক্ত অনুদান অন্তর্ভুক্ত। ২০১৬-১৭-র কেন্দ্রীয় বাজেট এই যোজনার অগ্রাধিকার ঠিক করে দিয়েছে। ত্বরান্বিত সেচ সুবিধা কর্মসূচির আওতাভুক্ত ৮৯-টি ঝুলে থাকা সেচ প্রকল্প দ্রুত শেষ করা হবে। এই প্রকল্পগুলি থেকে সেচের সুবিধে পাবে ৮০.৬ লক্ষ হেক্টর জমি। আগামী বছর দরকার হবে ১৭ হাজার কোটি টাকা। তারপরের ৫ বছরে ৮৬ হাজার ৫শো কোটি। ২০১৭-র মার্চের আগে ২৩-টি প্রকল্প সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য আছে। নাবার্ডে প্রাথমিকভাবে ২০ হাজার কোটি টাকার একটি দীর্ঘমেয়াদী সেচ তহবিল গড়া হবে। এসব লক্ষ্য পূরণের জন্য ২০১৬-১৭-তে বাজেট বরাদ্দ এবং বাজার থেকে ঋণের মাধ্যমে মোট ১২,৫১৭ কোটি টাকার সংস্থান করা হয়েছে।

জল সংরক্ষণ ও সংগ্রহের জন্য অনেক রাজ্য নতুন নতুন ব্যবস্থা নিচ্ছে। জলাশয় তৈরি ও সংস্কারের জন্য বাণিজ্যিক সংস্থার সামাজিক দায়িত্ব তহবিল কাজে লাগাচ্ছে মহারাষ্ট্রের 'জলযুক্ত শিওয়ার' প্রকল্প। বিন্দু এবং ছোটানো সেচ (ড্রিপ অ্যান্ড স্প্রিংকলার) ব্যবস্থার জন্য কর্নাটক সরকার ভরতুকি বাড়িয়ে দিয়েছে। সেরাজ্যে ক্ষুদ্র সেচে এ ধরনের ব্যবস্থায় কেন্দ্রের ভরতুকির সঙ্গে রাজ্য সরকারের ভরতুকি জুড়ে ১০০ শতাংশ খরচই মিটিয়ে দেওয়া হয়। ক্ষুদ্র সেচের জন্য চাষিদের সঙ্গে হাত মেলানোর অসাধারণ এক ব্যবস্থা করেছে গুজরাত। কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে টাকা পেয়ে গুজরাত সবুজ বিপ্লব নিগম ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প রূপায়ণ করে। প্রথম তিন বছর এই প্রকল্প দেখভালের দায়িত্ব তুলে দেয় চাষিদের হাতে। সেচের জন্য রাজস্থানে অনেক খাল কাটা হয়েছে। খালের পাড় ধসে যাওয়া, খাল বুজে আসা ইত্যাদির দরুন জলের টাটাটানি ঘটে আকছার। সেজন্য ওই রাজ্য কম জল খরচ করে চাষের কাজ মেটাতে স্প্রিংকলার বা ছোটানো সেচে জোর দিয়েছে। জল সংরক্ষণ, সংগ্রহ ও সুষ্ঠু ব্যবহারের জন্য অন্যান্য রাজ্যও খুব অভিনব কিছু ব্যবস্থা রূপায়ণ করেছে।

(২) **প্রধানমন্ত্রী কৃষি বিমা যোজনা :** জাতীয় কৃষি বিমা প্রকল্প ও সংশোধিত জাতীয় কৃষি বিমা প্রকল্প তুলে দিয়ে ২০১৬-র খরিফ মরশুম থেকে চালু হয় প্রধানমন্ত্রী ফসল বিমা যোজনা। আগেকার দুই বিমা প্রকল্প থেকে এ যোজনার ফারাক এই যে সারা দেশে অ্যাকচুয়ারিয়াল প্রিমিয়াম বা কিস্তি বাবদ চাষির দেয় অংশ কমানো হয়েছে। খরিফ খাদ্যশস্য, ডাল ও তৈলবীজের জন্য এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সীমা বিমাকৃত অঙ্কের ২ শতাংশ। রবি খাদ্যশস্য, ডাল ও তৈলবীজে ১.৫ শতাংশ। আর খরিফ ও রবি বার্ষিক বাণিজ্যিক/বার্ষিক উদ্যানজাত বা হর্টিকালচার ফসলের ক্ষেত্রে ৫ শতাংশ। ২০১৬-১৭ সালের জন্য এ যোজনায় বরাদ্দের অঙ্ক ৫৫০০ কোটি টাকা। ২০১৬-র খরিফ মরশুম থেকে এই প্রকল্প শুরু করার জন্য রাজ্যগুলিকে অনুরোধ করা হয়েছে। এই বিমা যোজনায় প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য ফসলহানির ঝুঁকি থেকে চাষি অনেকটা রেহাই পাবে।

(৩) **মাটির উর্বরতা কার্ড প্রকল্প বা সয়েল হেলথ কার্ড স্কিম :** সবুজ বিপ্লব শুরু হওয়া ইস্তক দেশে সার ব্যবহার বেড়ে চলেছে। কিন্তু সুসমঞ্জসভাবে নয়, ইউরিয়ার বিক্রি বেড়েছে লাগামছাড়া। ইউরিয়া হচ্ছে নাইট্রোজেনের উৎস। সাতের দশকের গোড়ার দিকে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ প্রয়োগের গড় অনুপাত ছিল ৬ : ১.৯ : ১। ১৯৯৬-এ তা দাঁড়ায় ১০ : ২.৯ : ১। এরপর অবশ্য কিঞ্চিৎ হলেও এই অনুপাত কমতির দিকে ঝোঁকে। ২০১২-১৩-তেও তা ছিল ৮.২ : ৩.২ : ১। সবার ধারণা, ভারতে চাষিরা বড় বেশি ইউরিয়া ব্যবহার করে। কিন্তু উপরের তথ্য থেকে বোঝা যায় এই মতামত বড় বেশি সাদামাটা। জমি ও ফসলের ধরনধারণ, সেচ বনাম বৃষ্টি নির্ভর এলাকা—এসব মাথায় রেখে আরও সূক্ষ্মভাবে বিষয়টি খতিয়ে দেখা দরকার। সারের সুষ্ঠু ব্যবহারে চাষিকে সক্ষম করে

তুলতে হবে। নিজের জমির গুণাগুণ সম্পর্কে চাষিকে ওয়াকিবহাল রাখতে এখন তাই মাটির উর্বরতা কার্ড প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে। ২০১৭-র মার্চ নাগাদ দেশের ১৪ কোটি কৃষি জোতকেই এই প্রকল্পের আওতায় আনার লক্ষ্য ধার্য হয়েছে। মাটির স্বাস্থ্য ও উর্বরতা সংক্রান্ত জাতীয় প্রকল্প খাতে দেওয়া হয়েছে ৩৬৮ কোটি টাকা। এছাড়া, আগামী ৩ বছরে সার সংস্থাগুলির ২০০০-টি মডেল খুচরো বিক্রয়কেন্দ্রে মাটি ও বীজ পরীক্ষার ব্যবস্থা করা হবে।

(৪) **পরম্পরাগত কৃষি বিকাশ যোজনা ও উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জৈব চাষ :** দেশে চাষের জমির প্রায় ৫৫ শতাংশ বৃষ্টির দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভরশীল। এসব জমিতে ফসল বাড়াতে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে জৈবচাষে। সরকার দু'টি উল্লেখযোগ্য প্রকল্পে হাত দিয়েছে। প্রথম, পরম্পরাগত কৃষি বিকল্প যোজনা। এই প্রকল্পে ৩ বছরে ৫ লক্ষ একর জমি জৈব চাষের আওতায় আনা হবে। দ্বিতীয়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে জৈব চাষের প্রসার। এই প্রকল্পের লক্ষ্য অনুযায়ী উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলিতে জৈব চাষ বাড়ানো ও মূল্য সংযোজনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে; যাতে এখানকার জৈব উৎপাদন দেশবিদেশের বাজার ধরতে পারে। এই দু'টি প্রকল্প বাবদ বরাদ্দের অঙ্ক ৪১২ কোটি টাকা।

(৫) **জাতীয় কৃষি বাজার :** মাণ্ডিতে কর ধার্য করার নিয়মকানুনে কোন মাথামুণ্ডু নেই। তদুপরি কর ও লেভির পরিমাণে বাড়াবাড়ির দরুন ফসল বিপণন ব্যবস্থার ভোগান্তির একশেষ। কর ব্যবস্থায় স্বচ্ছতার অভাব। রাজ্যে রাজ্যে কর হারেও রয়েছে ফারাক। ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়ার ক্ষেত্রে চাষির কাছে এ এক মস্ত সমস্যা। সমস্যা সামাল দিতে কর্নাটক এক মডেল বানিয়েছে। এই মডেলে এক লাইসেন্স ব্যবস্থার আওতায় আনা হয়েছে বেশ কয়েকটি বাজারকে। এই মডেলকে ভিত্তি করে সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় কৃষি বাজার সংক্রান্ত নয়া প্রকল্প অনুমোদন করেছে। কৃষি-প্রযুক্তি পরিকাঠামো তহবিলের মাধ্যমে ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৭-১৮ পর্যন্ত এই প্রকল্প রূপায়ণের জন্য বাজেটে দেওয়া হয়েছে ২০০ কোটি টাকা। কৃষি, সমবায় ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের আওতাধীন স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা, ক্ষুদ্র চাষি কৃষি-ব্যবসা গোষ্ঠী মারফত জাতীয় কৃষি বাজার (NAM) প্রকল্প কার্যকর করার কথা ভাবা হয়েছে। এই প্রকল্পে এক সর্বভারতীয় বৈদ্যুতিন বাণিজ্য পোর্টাল গড়ে তোলার সংস্থান করা হয়েছে। ফসলের জন্য এক সংযুক্ত জাতীয় বাজার গঠন করার জন্য এই পোর্টাল কিছু বাছাই করা কৃষিপণ্য বিপণন কমিটির নেটওয়ার্ক তৈরি করবে। এই ই-প্ল্যাটফর্মের সুযোগ মিলবে দেশের নির্বাচিত ৫৮৫-টি নিয়ন্ত্রিত পাইকারি বাজারে। গোটা রাজ্যে এক লাইসেন্স, এক বাজার কর এবং দাম মেটানোর জন্য বৈদ্যুতিন নিলাম ব্যবস্থার ক্ষেত্রে সংস্কারে এগিয়ে থাকা রাজ্যগুলি থেকে এসব নিয়ন্ত্রিত পাইকারি বাজার বেছে নেওয়া হবে।

(৬) **দাম স্থিতিশীলতা তহবিল :** ফসলের দামের চটজলদি ওঠাপড়া চাষির কাছে এক বড় সমস্যা। ফসল উঠলে প্রায়শই জলের দামে বেচতে হয়। কঠোর মেহনতের ফল মেলে না। কেনার সময় কিন্তু উলটপুরাণ। চাষিকে তখন তার সাধ্যের অতীত খরচ করতে হয়। পচনশীল কৃষি ও উদ্যানজাত পণ্য সংগ্রহ এবং বণ্টনের জন্য দাম স্থিতিশীলতা তহবিল গড়া হয়েছে। এহেন ফসল সংগ্রহ ও বণ্টন বাবদ চলতি মূলধন (ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল) এবং অন্যান্য ব্যয় যোগানো এই তহবিলের লক্ষ্য। চাষি এবং গ্রাহকের স্বার্থও এতে সুরক্ষিত থাকবে।

(৭) **রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশন :** কৃষিক্ষেত্রে মোট মূল্য সংযোজনের ২৫ শতাংশ আসে পশুপালন থেকে। পশুপালন প্রায় ২ কোটি ১০ লক্ষ মানুষকে সুনিযুক্তির সুযোগ দেয়। কৃষিতে দ্রুত বিকাশকারী ক্ষেত্রের অন্যতম এই পশুপালন। এথেকে দুটো বাড়তি পয়সার মুখ দেখে চাষিরা। অভাব-অনটন, বিপদ-আপদেও এ তাদের কাছে এক মুশকিল আসান। দেশি প্রজাতি সংরক্ষণের লক্ষে ২০১৪-১৫-এ রাষ্ট্রীয় গোকুল মিশনের পথ চলা শুরু। দেশি গবাদি প্রাণির উন্নয়নের জন্য সংহত গবাদি পশু উন্নয়ন কেন্দ্র—গোকুল গ্রাম গড়ে তোলার পরিকল্পনাও আছে এই মিশনে। মিশনের জন্য ২০১৩-১৪ থেকে ২০১৬-১৭ ইস্তক বরাদ্দ ৫০০ কোটি টাকা।

(৮) **জাতীয় কামধেনু প্রজনন কেন্দ্র :** দেশি প্রজাতির উন্নয়ন, সংরক্ষণ-সুরক্ষার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ ভারতে একটি করে জাতীয় কামধেনু প্রজনন কেন্দ্র গড়ে তোলা হচ্ছে। এক পূর্ণাঙ্গ ও বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতিতে দেশি প্রজাতির উন্নয়ন ও সংরক্ষণের উৎকর্ষ কেন্দ্র হিসেবে তা কাজ করবে। দেশি গরু-মোষের সব প্রজাতি (৩৯-টি গরু, ষাঁড় ও ১৩-টি মোষ), মিথুন ও ইয়াক সংরক্ষণ এবং উন্নয়ন করা হবে। এদের উৎপাদনশীলতা ও জিনগত গুণমান বাড়ানো এর উদ্দেশ্য। দেশি জার্ম-প্ল্যাজম এর এক ভাণ্ডার হওয়া ছাড়াও, কেন্দ্রটি দেশে সার্টিফায়েড জার্ম-প্ল্যাজম এর উৎস হয়ে উঠবে। এই কেন্দ্র গড়ে তোলার জন্য মধ্যপ্রদেশ ও অন্ধ্রপ্রদেশকে ২৫ কোটি টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

(৯) **নীল বিপ্লব :** মাছচাষ ও মৎস্যজীবী বা মেছুয়াদের উন্নয়নের বিস্তর সুযোগ আছে। এটা বুঝে নীল বিপ্লবের আওতায় সংহত মাছচাষ উন্নয়নের প্রকল্প চালু হয়েছে। আগামী ৫ বছরে এ বাবদ বরাদ্দের অঙ্ক তিন হাজার কোটি টাকা।

(১০) **বাজেট সহায়তা :** এসব কাজকর্মে সমর্থন যোগাতে সরকার ২০১৬-১৭-র বাজেটে পর্যাপ্ত সাহায্যের ব্যবস্থা রেখেছে। কৃষি মন্ত্রকের জন্য বরাদ্দ করেছে ৩৫,৯৮৪ কোটি টাকা। এছাড়া, চাষিদের ৯ লক্ষ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হবে। সর্বোপরি, গ্রামে রাস্তাঘাট, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য সামাজিক ক্ষেত্রে লগ্নির উদ্যোগে গ্রামাঞ্চলের ভোল যাবে বদলে—আসবে আমূল পরিবর্তন। মোদ্দাকথা, এসব ব্যবস্থার দরুন চাষিদের কল্যাণ হবে। গ্রাম ভারতে আসবে দীর্ঘস্থায়ী বিকাশ ও সমৃদ্ধি।❑

(**লেখক পরিচিতি :** লেখক ভারত সরকারের নীতি আয়োগের কৃষি বিষয়ক উপদেষ্টা। ইমেল : mishrajaip@gmail.com)